দক্ষিণ ২৪ পরগনার পথঘাট সেকাল থেকে একালে

অলক মণ্ডল

১৭৫৭, ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পলাশীর যুদ্ধে পতনের পর ১৭৫৭, ৩০শে জুন তারিখে সিরাজের রক্তাক্ত মৃতদেহ কবরস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পরাধীনতার সূচনা হল, নামেমাত্র নবাব নিমকহারাম মিরজাফরের হাত থেকে ১৭৫৭র ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তার নম্বর চুক্তি অনুযায়ী ২৪টি মহলা বা পরগনার জায়গীর (কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত) ইংরেজেদের হাতে হস্তান্তরিত হল। বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫) ইংরেজদের পক্ষে ২৪টি পরগনা একত্র করে একটি জেলা ঘটন করেন এবং তখন এই সমষ্টিগত অঞ্চলের নামকরণ হয় চব্বিশ পরগনা জেলা। দীর্ঘদিন অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জেলার মর্যাদা বহন করে এসেছে। প্রশাসনিক কারণে চব্বিশ পরগনা জেলা ১৯৮৬র ১লা মার্চ তারিখে দুভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়। নদীমাতৃক চব্বিশ পরগনাকে (দক্ষিণ) একসময় বলা হত 'আটারো ভাটির দেশ'। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ভৌগোলিক আয়তন ১০,১৫৯ বর্গকিলোমিটার। এখানকার ইতিহাসের পটভূমি প্রাচীন। এদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও লেখ - নজির সে প্রমাণের অভাব নেই। রামায়ণের বালকান্ডে এ অঞ্চল সহ সমগ্র উপকূলবঙ্গের উল্লেখ রয়েছে 'রসাতল' বলে। মহাভারতেও এ জেলার অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর সঙ্গমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে বর্তমান হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গা তিনটি শাখায় যুক্ত হয়ে সাগরসঙ্গমে প্রবাহিত হতো। দক্ষিণ - পশ্চিমের শাখাটি সরস্বতী, মধ্যের মূল শাখাটি গঙ্গা - ভাগীরথী বা হুগলি এবং দক্ষিণ পূর্বের শাখাটি ছিল যমুনা, যার একটি প্রধান উপশাখা ছিল বিদ্যাধরী। মুক্তাবেণী গঙ্গার এই তিনটি শাখাই কিন্তু সেকালে বর্তমানের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভূখন্ডের অসংখ্য স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি করেছিল। মুক্তবেণী গঙ্গার এসব বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে সম্ভবত মূল শাখাটি আদিগঙ্গা নামে পরিচিতি লাভ করে। আদি সপ্তগ্রামের প্রান্তসীমা দিয়ে প্রবাহিতা সরস্বতী নদীর পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল স্ফীতকায়া ও বেগবতী। সেকালে হাওড়া ও সাঁকরাইলের পথে দামোদর ও রূপনারায়ণের জল বহন করে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তসীমা দিয়ে সরস্বতী স্রোতোধারা সাগর পর্যন্ত প্রবাহিত হত। সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন কারণে সরস্বতী মজে যাওয়ায় সাঁকরাইল থেকে সাগর পর্যন্ত বিশাল নদীখাত শুষ্ক ও বালুকাময় হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে কালীঘাট, বোড়াল, বারুইপুর, জয়নগর, ছত্রভোগ, খাড়ি সাগরদ্বীপ দিয়ে প্রবাহিতা আদিগঙ্গার নিম্নপ্রবাহ দিয়ে হুগলি বন্দর পর্যন্ত সমুদ্রগামী নৌযান চলাচলে বিঘ্ন হয়। লোকশ্রুতি আছে, নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে (১৭৪০-৪৬) খিদিরপুর থেকে হাওড়া সাঁকরাইল পর্যন্ত একটি খাল খনন করে তৎকালীন ভাগীরথীর জলপ্রবাহে প্রাচীন সরস্বতীর পরিত্যক্ত খাত দিয়ে সোজাসুজি সাগরসঙ্গমে প্রবাহিত করা হয়। কালক্রমে এ প্রবাহ বিশাল আকার ধারণ করে বর্তমান হুগলি মোহনায় পরিণত হয়। আর খিদিরপুর থেকে আদিগঙ্গার পরিত্যক্ত খাতটি মজে যায়। ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে বিচ্ছিন্ন জলধারা ছিল যমুনা, এ যমুনারই একটি প্রধান উপশাখা ছিল বিদ্যাধরী। একসময় বিদ্যাধরী আবার অসংখ্য শাখা - প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পূর্বভাগের বিস্তৃত অঞ্চল বিধৌত করে প্রবাহিত ছিল। আজ মহানদী বিদ্যাধরী ভিন্ন এক রূপ, ভিন্ন ভিন্ন নামে অসংখ্য শীর্ষ জলধারামাত্র। মহানগরী কলকাতার দুষিত জল ও বর্ষার প্লাবন নিকাশে বিদ্যাধরীর খাত আজ ব্যবহৃত। প্রাচীন সরস্বতী নদীখাতে প্রবাহিত বর্তমান হুগলি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা এ অঞ্চলের সঙ্গে সুদূর অতীতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির সঙ্গে নৌপথে যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করে। সুপ্রাচীনকালে আদিগঙ্গার অববাহিকারে অবলম্বন করেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বসতি বিস্তার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধতা লাভ করেছিল। বিদ্যাধরী দক্ষিণে ২৪ পরগণার পূর্বখন্ড বিধৌত করে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে সাগরসঙ্গমে প্রবাহিত। সুন্দরবনের দুর্গম লাট অঞ্চল সমূহ এই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্য দিয়ে মেরুদন্ডের মতো ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল।

অসংখ্য নদীনালা ও আদিগঙ্গা বেষ্টিত এই অঞ্চলের প্রাচীনকালের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ নদীপথে নৌকা বা আদিগঙ্গার তীর ধরে সরু ঘন জঙ্গা লাকীর্ণ শ্বাপদ - সঙ্কুল মগদস্যু অধ্যুষিত আলপথ বেয়ে পায়ে হেঁটে যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলটি নদী আর কালের জলে ভরা, তাই যাতায়াতের ব্যবস্থায় নৌকার স্থান ছিল সর্বাগ্রে।

প্রাচীনকালে 'দ্বারির জাঙ্গাল' নামে একটি প্রাচীন পথ কালীঘাট থেকে ছত্রভোগ দিয়ে রায়দিঘির কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ অঞ্চলে (সুন্দরবনে) আসবার একমাত্র পথ ছিল এটি। পূর্বে লোকে ওর উপর দিয়ে গঙ্গাসাগরে আসতো। ইংরেজ আমলে কুলপি রোড নামে বিখ্যাত রাস্তা নির্মাণের পর এটা ক্রমশ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে ও মেরামতের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচীনকালে এটাই হরিদ্বার গঙ্গাসাগর রাস্তা নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে তখন হরিদ্বার থেকে লোকে ছত্রভোগ দিয়ে এই পথেই গঙ্গাসাগরে যেত। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইংরেজরা একে 'Pilgrim's Track' বলত। পূর্বে এটাই কালীঘাট থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাত্রীপথ রূপে উত্তরদিকে বর্তমান কলকাতা শহরের উত্তরাংশে অবস্থিত চিৎপুর রোডের দিকে গিয়েছিল। কারও কারও মতে এর উত্তর অংশের ওপর বর্তমানকালের কলকাতা শহরের চৌরাঙ্গী রোড ও চিৎপুর রোড নির্মিত হয়েছে। (কলিকাতা - সেকালের ও একালের - শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই পথের ওপর দিয়ে জাহ্নবীর তীর ধরে (বর্তমান কুলপি রোড বা নেতাজী সুভাষ বসু রোড) চৈতন্যদেব তাঁর ২৪ বছর বয়সে আটিসারা গ্রাম থেকে নীলাচল যাবার জন্য ছত্রভোগে এসেছিলেন। তাঁর যাত্রাপথে তিনি আদিগঙ্গার তীর ধরে বৈষ্ণবঘাটা গড়িয়া অতিক্রম করে এসে বারুইপুরের কাছে আটিসারা গ্রামে একরাত্রি কাটিয়েছিলেন। তৎসময়ে আদিগঙ্গা খরস্রোতা। ব্যাপ্তিতে বিশাল এবং এই অঞ্চলের (বারুইপুর) ওপর দিয়ে প্রবহমান ছিল। অনুমান তিনি আদিগঙ্গা দিয়ে নৌকা করে এবং জলপথ ব্যবহার করে নীলাচলে পৌঁছান। দক্ষিণাঞ্চলে যাবার একমাত্র প্রাচীন রাজপথটিকেই 'দ্বারীর জাঙ্গাল' এর চিহ্ন অষ্টাদশ/ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবলুপ্ত। কোনো কোনো গ্রামের মধ্যে তার একটু আধটু চিহ্ন আজও দেখা যায়। কাজেই দক্ষিণে যাবার রাস্তা বারুইপুরের পর আর নেই। একটি কুল গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জয়নগরের মিত্রবংশের ২০তম পুরুষ মধুসূদন মিত্র মহাশয় ভূমিদান করে বিষ্ণুপুর (দক্ষিণ) থেকে বারুইপুর পর্যন্ত এই রাস্তাটি তৈরি করে দেন। ইনি ছিলেন জয়নগরের দ্বাদশ মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনজনের মধ্যে একজন। আর ক্যানিং রাস্তা? এটা তৈরি হয় আনুমানিক বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে। শোনা যায়, ক্যানিং যাবার জন্য প্রথমে তোড়জোড় হয় সীতাকুন্ড, থেকে চিত্রশালী, পুঁড়ি প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে পিয়ালী নদী পর্যন্ত একটি রাস্তার। কাঁচা রাস্তা তৈরিও হয় এবং আজও সে রাস্তা আছে।

পরে বারুইপুরের জমিদার দেবেন্দ্র রায়চৌধুরী ও রামনগরের জমিদার কৈলাস ঘোষের যৌথ উদ্যোগে মিলিত হয়ে ঐ রাস্তাটি বাতিল করে বর্তমান ক্যানিং রোড, পিয়ালি নদী পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটি নিজেরা ভূমিদান করে তৈরি করেন। পিয়ালির পরপার থেকে প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন বর্তমান রাস্তার অদূরে আজও দেখা যায়। ১৮৪৭-৮৪ সালের 'থাকজরিপে'র ম্যাপে এসব রাস্তার চিহ্ন ছিল না। আর রেলপথ তো তখন দূর - অস্ত। কাছেই একমাত্র ভরসা আদিগঙ্গা। নৌকা নিয়ে যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না।

উনিশ শতক এবং বিশ শতকের পাঁচের দশক পর্যন্ত এই জেলায় নৌকা পরিবহন এক বিশেষ জায়গা জুড়ে ছিল। এই জেলা বিশাল অংশ নদী, এসচুয়ারি, ক্রীকগুলি পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং সমুদ্র সংলগ্ন থাকায় ছিল জলপথ নির্ভর। নৌকা যোগাযোগই ছিল একমাত্র উপায়। ইংরেজ সরকার এই জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত। ইংরেজ আমলে নদীখালের এই সুসংবদ্ধ প্রণালি পৃথিবীর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ বলতে ইংরেজ ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছিলেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া বণিক কোম্পানির আমল। প্রথম জলপথ প্রকল্পে অগ্রণী ছিলেন মেজর টলি নামে জনৈক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার। ১৭৭৫ সালে তিনি আদিগঙ্গার প্রাচীন নদীগর্ভ খনন করেছিলেন— ''To the North of Alipore flows Tolly Nullah called after Colonel Tolly...Colonel Tolly excavated a portion of the aeek in 1775...It is supposed that Ganges one flowed on thg site of Tolly's Nullah." Carry Good old days of Jon Company. Vol, II, Page 157 নালা দিয়ে নৌ চলাচল শুরু হয় : ১৯৭৭ সালে। ফোর্ট উইলিয়ামের সামান্য দক্ষিণে ছিল হেস্টিংসের কাছে আদিগঙ্গা আর হুগলি নদীর সঙ্গম। সে সময়ে দক্ষিণ পূর্বমুখী ৮ মাইল দূরে গড়িয়া পর্যন্ত, টলির নালা নামে খ্যাত এই খাল থেকে কথাটার খালটিকে পূর্বদিকে সোনারপুর থানার অন্তর্গচ শামুকপোতার কাছে বিদ্যাধরী নদীর সাথে যুক্ত করা হয়। এবং ফলে ক্যানিং থেকে পুর্বদিকের ভিতরে যাবার জলপথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

টালির নালা থেকে ২০ মাইল লম্বা এক খাল ক্যাওড়াপুকুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ মগরাহাট পর্যন্ত চালু ছিল - এই খাল দিয়ে জয়নগর মজিলপুর যাওয়া যেত। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৬৪ সালে আদিগঙ্গার খালপথে নৌকায় ভবানীপুর থেকে মজিলপুর আসার সময় ঝড়ের মুখে পড়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে এই পথের বর্ণনা রেখেছেন। উনিশ শতকের শেষভাগেও ধান চালের একটা বিখ্যাত গঞ্জ ছিল মগরাহাট। ইস্পাহানি কোম্পানির ধানের গোডাউন এখানে ছিল। সারা সুন্দরবন এলাকার ধান এখানে সংগ্রহ করা হত এবং নৌকার সাহায্যে কলকাতায় চালান দেওয়া হত। স্রোতস্বিনী বিদ্যাধরী, করতোয়া, আঠারবেঁকী নদীর মিলনে মাতলার সৃষ্টি; বিশাল জলধারা নিয়ে মাতলা ক্যানিং -এর পাশ দিয়ে সমুদ্রে মিলেছে। মাতলাকে বিকল্প বন্দর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জরুরী উদ্যোগ নেওয়া হয়। বারুইপুর থেকে মাতলা পর্যন্ত রাস্তাকে পিচের রাস্তায় পরিণত করা হল, গড়াই নদীতে ব্রিজ করার ব্যবস্থা হলো - পিয়ালী নদীতে ঘাট তৈরি করা হলো।

১৮৫৮ লাসে মাতলা বন্দর (পোর্ট ক্যানিং নির্মাণ করার কাজ চালু হয়েছিল। ইংরেজ বনিক কোম্পানির শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সাহেবের নামানুসারে ক্যানিং বন্দরের নাম হয়। পোর্ট ক্যানিংয়ে জাহাজ ভিড়তে শুরু করে ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭০।' ৭১ সাল থেকে বন্দরে আর জাহাজ আসেনি। কলকাতার বিকল্প বন্দর হিসাবে পোর্ট ক্যানিং তৈরি হয়। কলকাতা থেকে বারুইপুর পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ করা হয়েছে ১৯৯৫ সালে বারুইপুরের জমিদারদের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে বারুইপুরের রাস্তা মাতলা পর্যন্ত বাড়ানো হয় বন্দর তৈরির প্রয়োজনে। কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত রাস্তা উনিশ শতকের শুরুতে করা হয়। ডায়মন্ডহারবার রোড তৈরি হয় ১৮১৫ সালের কয়েক বৎসরের মধ্যে। ১৮১৫ সালের সংবাদে বলা হয়—''An establishment of Royal Mail Coaches are about to take place between Calcutta And Diamond Harbour to run every morning and evening from the respective Mail Offices in Calcutta and at Diamond Harbour as soon as the Road of Diamond Harbour is finished...there will be releys of horses at every eight miles...The Royal Mail will carry four inside and six outside passengers". (Calcutta Gazetters). অর্থাৎ ডায়মণ্ডহারবার রোডে ঘোড়ার গাড়ি চলাচলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ইন্ডিয়া জেনারেল এন্ড রিভারস স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির (IGSRN) বড় বড় স্টিমার কলকাতা থেকে হুগলি নদী দিয়ে ঘোড়ামারা যাবার পর মুড়িগঙ্গা বা বড়তলা বা ক্রীক চ্যানেলে প্রবেশ করে হাতানিয়া - দোয়ানিয়া পথ দিয়ে একসময় যেত।

৩০টি স্লুইস দ্বারা হুগলি নদী সংলগ্ন ডাযমন্ডহারবার ক্রীক বা আদিগঙ্গার একটি বিচ্ছিন্ন ধারাকে গ্রামবাসীরা বলে হাজীপুর খাল। ক্যানালাইজড্ হয় ১৯০৩ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে। দুটি লকগেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি জলধারার মধ্য দিয়ে জেলার অভ্যন্তরে এবং কলকাতা পর্যন্ত নৌ চলাচল করত। ১৯৬৬ সালে এটি বন্দ করে দেওয়া হয়। ডায়মণ্ডহারবারের আশেপাশে ছোট ছোট খালে বছরে প্রায় ৮ মাস শালতি, ডোঙ্গা চলাচল করত। জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত খালগুলো প্রায় শুকনো থাকত। এরা সহ শিরাকোল থেকে জোবরালি, ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশে, প্রায় ১২ মাইল লম্বা, সাপগাছি থেকে ধাপার কাছে চৌভাগা, ২মাইল লম্বা। এইখাল ১৮৮২ সালে সরকারি খরচে খাসমহল ডিপার্টমেন্ট প্রথম কাটে। আর মগরাহাট থেকে জয়নগর খাল ছিল সাড়ে ছয়মাইল লম্বা। নিকটস্থ ফলতা অঞ্চলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ছিল না, বড় রাস্তা তো নয়ই, সামান্য গ্রাম্য মেটে রাস্তাই ছিল যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন। শালতি জলযান যোগাযোগ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হত। বাইরের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয় ডায়মণ্ডহারবার রোজ ও ফলতা দেবীপুর রোজ হাওযার পর থেকে। ফলতা দেবীপুর রোড পাতা হয়, ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। কালীঘাট ফলতা ন্যারোগেজ রেল চলাচল শুরু হয় ১৯৩২ সালে। রেল চলাচল শুরু হওয়ার আগে কলকাতার সঙ্গে এ অঞ্চলের লোকের যোগাযোগ চলত হেঁটে বা স্টীমারে। পায়ে হেঁটে অনেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে যেত, ফলতা থেকে আর্মেনিয়া ঘাট পর্যন্ত স্টিমার চলাচল করত। ১৯৬১ সালে ফলতা - কালীঘাট ন্যারোগেজ রেলপথটি (মার্টিন কোম্পানির) বন্ধ হয়ে যায়।

১৭৭৮ সালে জেমস রেনেলের [James Rennel (1764 - 1777)] রচিত 'A Description of the Roads in Bengal and Bihar' গ্রন্থে প্রদত্ত এক ম্যাপে কলকাতার দক্ষিণে প্রসারিত একটা রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়। ঐ ম্যাপে কলকাতা থেকে একটা রাস্তা দক্ষিণে বজবজ ছুঁয়ে কুলপি পর্যন্ত গিয়েছিল। ম্যাপে রাস্তার গাযে কলকাতা, বজবজ, কুলপি ছাড়া আর কোন গ্রামের নামোল্লেখ নেই। ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত নদীর ধারে আই.বি.পি (ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিযাম) থেকে বজবজ জুট মিলের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত স্থানটা জুড়ে ছিল বজবজের প্রাচীন দুর্গ। বজবজ দুর্গ স্থাপনকাল থেকে বজবজ কলকাতার মধ্যে একটা সড়ক পথ ছিল। দুর্গ ভেঙে যখন প্রশস্ত মাঠে পরিণত করা হল তখন কলকাতা বজবজের রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেল আছিপুর। এই কলকাতা - আছিপুর রাস্তাকে বলা হয় 'ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড'। কারণ ঐ পথ ধরে আছিপুর পেরিয়ে হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা দিয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ করা যেত। সেদিন পর্যন্ত এই রাস্তা ধরে কত সাধু সন্যাসীর দল তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে পুরী যেত। মধ্যে মধ্যে উড়িষ্যাবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে মোটঘাট নিয়ে দেশে ফিরত। আবার ঐ পথে দিয়ে কর্মস্থলে ফিরে আসত। যেতে বা আসতে আছিপুরের খেয়াঘাট ব্যবহার করত। বজবজের সঙ্গে পরস্পরের ভিন্ন ভিন্ন জেলাগুলির যোগাযোগের এটাই ছিল পথ।

বজবজ কলকাতার চওড়া ও শক্ত বাস্তা ওপর দিয়ে প্রধানত পণ্য পরিবহণের জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহার হত। তারপর চালু হল

ঘোড়ার গাড়ি। বজবজ গঙ্গার ধারে বজবজ রাস্তা দিয়ে চড়ার ঘোড়া, বাগিগাড়ি, ডাকগাড়ি প্রভৃতির কলকাতায় যাওয়া আসার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘোড়ার টানা গাড়ি করে কলকাতায় যেতেন আসতেনই ইংরেজ সাহেবরা। 'ছক্কর দেওয়া ঘোড়ার গাড়ি শখানের বছর আগেও কলকাতা সংলগ্ন গ্রাম ও জেলার প্রধান ভরসা ছিল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতি সোমবার রাজপুর বাজার থেকে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কলকাতার পটলডাঙ্গার (কলেজ স্ট্রিট) সংস্কৃত কলেজে যেতেন। আর ফিরে আসতেন প্রতি শনিবার ওই ঘোড়ার গাড়ি করেই। শিয়ালদহের কাছে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা ছিল (আদিগঙ্গার তীরে - ড. প্রসিত রায়চৌধুরী)

বজবজের অভ্যন্তরে যোগাযোগের পথ ছিল দুটি বড় খাল- চড়িয়ালের খাল ও কালিনগরের (চিত্রগঞ্জের) এবং তাদের গা হতে প্রবাহিত পয়ঃপ্রণালীগুলি। নৌকা বা শালতি করে সে পথ অতিক্রম করা হত। বর্ষার সময় জলা ডুবে গেলে পথ সংক্ষিপ্ত করা জন্য তার উপর দিয়েও শালতি ডোঙ্গা যেত। বড় রাস্তার খাত ধরেও ওগুলি যেত ও আসত। হুগলি নদীতে প্রথম স্টিম নৌকা দেখা যায় ১৮২৩ সালে। ঐ সালের ১৪ই আগস্টের 'ক্যালকাটা গেজেটে' উল্লিখিত আছে 'স্টিম নৌকা প্রতিদিনই হুগলি নদীতে সক্রিয়ভাবে চলাফেরা করছে।' আগে সমুদ্রগামী পালের জাহাজ ছিল। 'এন্টারপ্রাইজ' নামের একটি স্টিম জাহাজ ১৮২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিলেত থেকে কেপ কলোনী ঘুরে ১১৩ দিন পরে হুগলি নদীতে এসে উপনীত হয়। প্রথম প্রথম জাহাজ পণ্য ও যাত্রী দুই বহন করত। ডাক আসত জাহাজে। পরে পণ্য ও যাত্রী আলাদা হল। বজবজে ইংরেজদের গতিবিধি বাড়তে লাগল। তবে যখন তারা দেশে যেতে বা দেশ থেকে ফিরত তখন সাধারণত কলকাতার পোর্ট ব্যবহার করত। যতদূর জানা যায় বজবজ নদীতে হোরমিলার এন্ড কোম্পানির স্টিমার প্রথম যাত্রী বহন শুরু করে। এটি আরমেনিযান ঘাট থেকে বজবজ ছুঁয়ে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত যাতায়াত করত, পরে একে গেঁওখালি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মজে যাওয়া গঙ্গাকে রেনেল একটি সঙ্কীর্ণ খালের আকারে বর্তমান পোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণ পূর্বাংশ থেকে কালীঘাট ও বারুইপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়ে পশ্চিম সুন্দরবণ প্রদেশের উত্তরে প্রবাহিত নালুয়ার গঙ্গা পর্যন্ত প্রদর্শন করেছেন। (Rennels Atlas, Plate 5, Parts IRII)

প্রাচীনকালে নিম্নবঙ্গে ঐ প্রবাহই (মজে যাওয়ার আগে) সমুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ ছিল তা বুঝতে পারা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাস পিপলাই এর 'মনসার ভাসান', ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর প্রভৃতির ঐ গঙ্গাপথে পুঃ পুনঃ সিংহলাদি দেশে বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ থেকে। সুন্দরবনের নবসৃষ্ট জনপদগুলিতে সরকারি উদ্যোগে কোন রাস্তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যাচ্ছে না। সে যুগে নদী বাঁধগুলি দিয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে চালু ছিল। নদী পারাপারের জন্য খেয়াঘাট সরকারি উদ্যোগে সে যুগে লিজ দেওয়া হত - এ ব্যবস্থা চালু হয় ১৮২০ সাল থেকে। তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই টাকা দেশের রাস্তা, নদী যোগাযোগের উন্নতির ব্যাপারে খরচ করা হবে। ১৮৪২ সাল থেকে এই টাকা বাংলার বিভিন্ন এলাকার সড়ক তৈরির ব্যাপারে খরচ করা শুরু হল। বাংলার অনেক বড় বড় রাস্তা এই ফান্ডের টাকায় তৈরি হয়েছে। ''Some of the most important inter - district roas of Bengal ware constracted and provided with substantial bridges and culverts where ever necessary by the Ferry Fund Committee.'' (A Bengal Zaminder, D. N. Mukherjee, Page 65). (তথ্যসূত্র : ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, শশাঙ্ক মণ্ডল)

বারুইপুর থেকে মাতলা, ডায়মণ্ডহারবারের পরবর্তীকালে সরকারি ফেরি ফান্ডের টাকায় খরচ হয়েছে। বারুইপুরের জমিদার ১৮২৪ সালে ৬৫০০ টাকা খরচ করে কলকাতা থেকে বারুইপুর পাকা সড়ক সংস্কার করেন। 'Construction of a Pucca Road at Baruipur from Russa Pugla at the instance of opulent Zaminder who agreed to subscrbe Rs. 6500 towards its construction.' (West Bengal State Archives)

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ২৪ পরগনার মাত্র ৭টি রাস্তা সরকারের পূর্তবিভাগ নিয়ন্ত্রণ করত এবং তার পরিমাণ ছিল ৭০ মাইল। যথা - গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড (২৩ মাইল), আক্রা থেকে মেটিয়াবুরুজ (৪ মাইল), বারুইপুর থেকে পার্ক রোড (৫০ মাইল) ইত্যাদি।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে (২০০২ - ২০০৩ বর্ষে) রাজ্য পূর্তদপ্তর কর্তৃক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ১২১৭ কিমি. (রাজ্য হাইওয়ে ২৯৪ কিমি. জেলা রোড ৪৫০ কিমি. ও গ্রাম্য সড়ক ৪৭৩ কিমি. একত্রে) রোড রাজ্য নিয়ন্ত্রিত [সূত্র : রাজ্য পূর্ত দপ্তর (সড়ক]

মাতলা নদীর উপকূলে ক্যানিং পোর্ট খোলার সময় স্থির হয় কলকাতার সঙ্গে রেল বা কালের যোগাযোগ থাকবে। একটি বেসরকারি কোম্পানি গভর্ণমেন্টের গ্যারান্টি সিস্টেমে রেললাইন খোলার ভার নিল। ১৯৬২ সালে এই লাইন বেলেঘাটা থেকে চম্পাহাটি পর্যন্ত খুলল ১৮৬৩ সালে ক্যানিং পর্যন্ত গেল। ১৮৮৮ সালে গভর্ণমেন্ট রেললাইনটিকে নিজের হাতে নেন।

ক্যানিং লাইনের সোনারপুর থেকে একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত যায় ১৮৮৩ সালে। সোনারপুর থেকে বারুইপুর পর্যন্ত ট্রেন চলে ১০ই জুলাই, ১৮৮২ সালে। বারুইপুর থেকে মগরহাট পর্যন্ত ট্রেন লাইন ১৮৮৩ সালে সম্প্রসারিত হয়। মগরাহাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ট্রেন চলে ২৫শে এপ্রিল, ১৮৮৩ সালে । বালিগঞ্জ থেকে বজবজ পর্যন্ত ট্রেন চলে ১লা এপ্রিল ১৮৯০ সালে। বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত ট্রেন লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে স্থাপন করা হয়। ১৯২৮ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রথম ট্রেন চলে ও এই লাইনের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয় ১৭ই জুন ১৯৬৬ সাল রবিবার থেকে। ট্রেনগুলি প্রথমে পণ্য বহন করত। পরে যাত্রীদেরও। বজবজ লাইনে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন এলো ১৯৬৭ সালে। ট্রেন আসার পর আগের যুগের ডুলি, পালকি, গরুরগুড়ি এমনকি ঘোড়ার গাড়িও ক্রমে কানা হয়ে যেতে লাগল। তারপরে বাস চালু হলে ওসব এক এক করে উধাও হল। ১লা আগস্ট ১৯৫৫ যখন ইস্টার্ন রেলওয়ে জোনের স্থাপনা হল তখন বজবজ লাইন, বারুইপুর লাইন, ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং লাইন তার অন্তর্ভুক্ত হয়। ট্রেনগুলির সবই শিয়ালদহ (সাউথ ডিভিশন) থেকে ছাড়ে।

বজবজে বাস চলাচল শুরু হয় ১৯২৬ সালে। ওয়াজেদ বক্স নামক এক ব্যক্তি বজবজ রুটের সূচনা করেন। প্রথমে চড়িয়াল থেকে মাঝেরহাট। কলকাতায় এরই মাত্র বছর দুই আগে ওয়ালফোর্ড কোম্পানি প্রথম নিয়মিত বাস - সার্ভিসের প্রবর্তন করেন। সম্ভবত ১৯৪২ সালে রুট চড়িয়াল থেকে আছিপুর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তখন ঐ একটিমাত্র রুট আছিপুর থেকে মাজেরহাট রুট নং ৭৭। বছর তিনেক পরে একটা ব্রাঞ্চ খুলল চড়িয়াল থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত। চড়িয়াল - বিড়লাপুর রুট নং হল ৭৭এ। ১৯৬৬ সালে দুটি রুট ৭৭ ও ৭৭এ এগিয়ে গেল এসপ্লানেড বা ধর্মতলা পর্যন্ত। ১৯৭৩ সালে ৭৭এ রুট বিড়লাপুর ছাড়িয়ে প্রসারিত হল মল্লিকপুর পর্যন্ত। ঐ সালের শেষদিকে একটা রুট খুলল ৭৭বি। - বাটানগর থেকে হাইডরোড খিদিরপুর হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত (বর্তমানে বন্ধ আছে)। আমতলা থেকে বজবজ পর্যন্ত একসময় ছিল মাটির রাস্তা। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পাকা রাস্তা হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আমতলা থেকে বাখরাহাট পর্যন্ত বাসরুটের (৭৭এ) নাম নিবারণ দত্ত রোজ এবং বাখরাহাট থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত নাম হয় কে. পি. মণ্ডল রোড। বারুইপুরে বাস চলাচল শুরু হয় ১৯৪৮ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে বারুইপুর রাসমাঠ। যাদবপুর হয়ে ৮০এ। আর একটি ৮০ চলতো টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে নাকতলা গড়িয়া হয়ে বারুইপুর রাসমাঠ। এই দুটো ছিল বারুইপুরের প্রথম বাসরুট। আমতলা

৯৭নং রুটের বাস চলাচল শুরু হয় বারুইপুর থেকে (বর্তমানে বন্ধ আছে)। কুনকুইনাল রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ১৮৪৭ - ৪৮ সাল পর্যন্ত বারুইপুর ক্যানিং রোড তৈরি হয়নি। পরে বারুইপুর থেকে সীতাকুন্ডুর মধ্যে দিয়ে ক্যানিং রোড তৈরি করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মাটি ফেলার কাজ শেষ হয়। বারুইপুর পৌরসভারও সরকারি উদ্যোগে বারুইপুর - ক্যানিং লাইনে, বারুইপুর - বিষ্ণুপুরে খাটুর মোড় - কল্যাণপুর রেলস্টেশন রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণের কাজ চলছে। তেমনি বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের পর অনেক কাঁচা রাস্তা পাকা হয়ে থাকে নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হতে থাকে। যেমন - পুরাতন রেলস্টেশন যাবার ফিডার রোড (বর্তমান নাম নেতাজী সুভাষ রোড) ডানকান রোড প্রভৃতি।

১৯৬৭ সাল থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড ৭৬নং বাসের রমরমা ছিল। ১৯৫২ সালে ৮৯ নং বাস কুলপি পর্যন্ত যেত। বর্তমানে ৭৬নং বাস আমতলা থেকে ই.এম.বাইপাসের কাছে রুবি হাসপাতাল পর্যন্ত চলেছে। ডায়মণ্ডহারবার পুরসভাও তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করেছে।

ফলতা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত মার্টিন কোম্পানির রেলপথ বন্ধ হবার পর থেকে (১৯৬১ থেকে) চালু হয় ৮৩নং বাসরুট। বর্তমানে বাবুঘাট থেকে বাখরাহাট ধরে ৭৫নং বাস বায়পুর নদীর ধার পর্যন্ত চলছে।

একসময় (১৯৫৯ - ৬১) দমদম সাগরদ্বীপ পর্যটন বিমান (Jama Air কোম্পানির) চালু হয়েছিল গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে। মেলার দুদিন আগেও সাগর স্নানের দিন বিমানগুলি পর্যটকদের নিয়ে সাগরে যেত। আবার পালা অনুযায়ী তাদের দমদমে ফেরত আনত। কমবেশি আধঘন্টা লাগত দমদম থেকে প্রায় ১০০ কিমি. আকাশ দূরত্বে সাগরদ্বীপ পৌঁছতে। (তথ্যসূত্র : বিশেষ প্রতিবেদন, সংবাদ প্রতিদিন, সাগর চট্টোপাধ্যায়, ২১.১২.২০০৪)

বর্তমানে হারউড পয়েন্ট ও কচুবেড়িয়ার মধ্যে ভেসেলে গঙ্গাসাগর পৌঁছান যায়। সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন। হাঁটাপথ আর নৌকায় ভুটভুটিতে যাতায়াত ছাড়া সুন্দরবনের অধিকাংশ অঞ্চলে যোগাযোগ রক্ষা অসম্ভব। সুন্দরবনের কয়েকটি অঞ্চলে ভ্রমনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে হয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিচ রাস্তা বা বড়ো মেটো রাস্তা তৈরি হয়েছে বাণিজ্যের খাতিরে যার একটা বড় অংশ পর্যটনবিভাগের সৌজন্যেই। কলকাতা শহর থেকে সুন্দরবন পৌঁছানোর কয়েকটি বড় সড়ক এবং একটি আংসিক রেললাইন কাকদ্বীপ - লক্ষ্মীকান্তপুর) ছাড়া এখনও ভ্যান, রিক্সা, গরুর গাড়ি, সাইকেল প্রভৃতি ব্যতিরেকে আর কিছু নেই। জলপথে কয়েকটি লঞ্চ সার্ভিস ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে বটে কিন্তু বেশিরভাগ সময় অনিয়মিত। নদীর পাড়ভাঙ্গা এবং জেটিঘাটগুলির সংস্কারের অভাবে লঞ্চগুলি পাড়ে ভিড়তে পারে না।

পথ, পরিবহন ও যোগাযোগ পরস্পর যুক্ত বলা চলে। জলনিকাশী ব্যবস্থা তেমন না থাকায়, বর্ষাকালে মানুষ ও যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের মধ্যে প্রথমে চালু হয়েছিল জলযানে করে মানুষ এবং মালবোঝাই বাস লরী গাড়ি ইত্যাদি পারাপার। যানবাহী জলযান ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক ভাবে যে জায়গাগুলিতে জেটি নির্মিত হয়েছে সেগুলি হল - কাকদ্বীপের লট নং আট, হলদিয়া, গোসাবা -গোদাখালি, ন্যাজাট, নামখানা, সন্দেশখালি, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, মৌসুমী, কুলতলী, রায়দিঘি, রায়চক এবং কুলপি। কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তপক্ষ সুন্দরবণ এলাকার নদীপথকে জাতীয় জলপথ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এখন ৬৪ টি ফেরিগাট জেলাপরিষদ নিয়ন্ত্রিত। বাকি ফেরিঘাটগুলি জলপথ সমবায় সমিতি পোর্ট কমিশনার্স এবং হুগলি নদীর তীবর্তী মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে নিয়ন্ত্রিত। ফেরির কাজে ব্যবহৃত বোটগুলি সবই প্রায় বড় বড় এবং মজবুত তার গঠন। ৫০ থেকে ১০০ মন বোঝা বইবার ক্ষমতা সম্পন্ন। বর্তমানে ভুটভুটি, লঞ্চ, হুগলি নদীর পারাপারের জন্য বেশি চলছে। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে ফেরি সার্ভিসই আজও যাতায়াতের প্রধান ভরসা।

পথঘাটের সমস্যা ও সমাধানের পথ : সহর থেকে সুন্দরবনে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে অনেক। যদিও সেগুলোর অবস্থা কহতব্য নয়। সরকারি পয়সায় কিছু রাস্তা মেরামতি হয় মাঝে মাঝেই। কিন্তু একটা বর্ষা গেলে রাস্তার অবস্থা যে কে সেই। কলকাতা থেকে প্রাইভেট ও সরকারি এক্সপ্রেস বাস চলছে উত্তরে হাসনাবাদ, বসিরহাট, ন্যাজাট ও চৈতলে এবং দক্ষিণে মালঞ্চ, ধামাখালি, সোনাখালি, ভাঙ্গনখালি হয়ে ডকঘাট রুটে। ধামাখালি কানমারির রাস্তা চওড়া হওয়া ভীষণ জরুরি। না হলে বাস উল্টে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যে কোনও সময় বিপদ বাড়ার সম্ভাবনা পদে পদে। সব থেকে খারাপ অবস্থা দক্ষিণ জয়নগর -ঢাকী রুটের ২৭ কিমি. রাস্তা প্রাইভেট বাস চলছে। যাচ্ছে ট্রেকার, অটোও। ঢাকীর মতোই অবস্থা পেটকুলচাঁদ - জামতলা রোডের। বড় ব্রিজ করা হয়েছে পেটকুলচাঁদ নদীর ওপর। সরকারি ও বেসরকারি বাসও চলেছে।

একই অবস্থা বাসন্তি - সোনাখালি। ঝড়খালি ও গোসাবা - রাঙাবেলিয়া পাখিরালয় ছোট রুটে। এইসব রাস্তায় বাংলাদেশ থেকে সহজে আসা মোটর লাগানো যান ও অটো রিকশার দাপাদাপি। রাস্তা যেমন খারাপ, তেমনি সংকীর্ণ। বর্তমানে সুন্দরবনের ৪০ লক্ষেরও অধিক জনগণের যাট শতাংশই ন্যুনতম পরিবহন পরিষেবা হিসাবে ফেরি সার্ভিসের ওপর নির্ভরশীল। দৈনন্দিন কাজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয় জোয়ারের সময় অবধি অপেক্ষা নয়, এক হাঁটু কাদা মাড়িয়ে নদীর মাঝপথ অবধি গিয়ে নৌকায় ওঠা ছাড়া গতি থাকে না। আগে দেখি নৌকা বা মোটর লঞ্চ চালু থাকলেও মাতলা, রায়মঙ্গল, বিদ্যাধরী, কালিন্দীর শাখা নদীর ও নালার গভীরতা ও নাব্যতা কমায় ভাঁটার সময় লঞ্চ চলাচল আজকাল একদমই হয় না। সুন্দরবনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ক্যানিং - এর অবস্থা সব থেকে করুণ। এখানে মোটর লঞ্চের দেখাই মেলে না। মানুষ কায়িক শ্রম থেকে অব্যাহতি চাইতে বেড়েছে যন্ত্রচালিত বিভিন্ন আকারের দেশি নৌকার বা ভুটভুটির চাহিদা। এই ভুটভুটিই সুন্দবনের দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের যাওয়ার এখন প্রধান যান। ক্যানিং কিংবা জয়নগরের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগকারী একমাত্র কুলপি রোড বারুইপুর মধ্যে নিত্য যানজটে তীব্র আকার ধারণ করেছে। বারুইপুরের ব্যস্ততম একমাত্র কুলপি রোড রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং তেমনই ক্রমশ জবরদখলে কুলপি রোড সহ পুরসভার আরও কিছু রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে। এখানে একটি ফ্লাইওভার বা উড়ালপুলস তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন আগে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেও আজও সেই কাজ এগোয়নি। ফলে বারুইপুর - কুলপি রোডে নিত্য যানজট লেগেই থাকে এবং দুধারের ফুটপাতও জবরদখল হয়ে গিয়েছে।

এদিকে গড়িয়া থেকে কামালগাজি পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়া আদিগঙ্গাকে বুজিয়ে কোথাও ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কোথাও মাটি দিয়ে ভরাট করে বিভিন্ন আবাসন গড়ে উঠছে। আদিগঙ্গার সংস্কারে উদ্যোগী পরিবেশবিদ রেবতীরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'আদিগঙ্গার আদি থেকে অন্ত' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বর্তমানের এই গঙ্গা দিয়ে কয়েকবছর আগেও ইট, বালি, টালি এবং নানাবিধ পণ্য বোঝাই বিশাল বিশাল নৌকা চলাচল করতো। মাঝে মাঝে গাদাবোট খড় বোঝাই লম্বা লম্বা শালতি এমন কী হাজার হাজার বাঁশ বেঁধে ভেলার মতন করে এই গঙ্গা দিয়ে নিয়ে আসত মাঝিরা। বহু বছর আগে বিখ্যাত বণিক চাঁদ সদাগর তাঁর বগলপুরের বাড়ি থেকে নৌকা যোগেই এই পথে বাণিজ্যতরী নিয়ে চলে যেতেন সুমাত্রা, জাভা, বোর্নি ও প্রভৃতি দেশে।

জুলপিয়া রোড ঠাকুরপুকুর থানার কবরডাঙা থেকে ১২ কিমি. আমতলা ও বারুইপুর চলে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে ৪০এ

বেসরকারি বাস, অটো, ভ্যানিরক্সা, মোটরবাইক, স্কুটার ও হাজারখানের সাইকেল চলে। এই সড়কটির বেহাল অবস্থা, খানাখন্দে ভরা, বর্ষায় অবস্থা আরও ভয়াবহ। এই সড়কের দুধারে গড়ে উঠেছে এসেম্বলি অফ গড চার্চ ও স্কুল, মাদার টেরিজা হাউস, রাঘবপুর সেন্ট পলস্ হাইস্কুল ও গীর্জা, ভারত সেবাশ্রম পরিচালিত হিন্দুমিলন মন্দির ও জুলপিয়া আঁদারমানিক হাইস্কুল।

ডায়মণ্ডহারবার শহরের যানজট প্রতিদিনের ঘটনা, প্রতিদিন মানুষকে হাজারো সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে বিশেষ করে শহরের প্রাণকেন্দ্র স্টেশন, বাজারের যানজট, রেলযাত্রী ছাড়াও সরকারি বাস, লাক্সারি বাস, মিনিবাস, ট্রেকার, অটো, লরি, ম্যাটাডোর, ট্যাক্সি, প্রাইভেট প্রভৃতি গাড়ি কলকাতা থেকে সর্বক্ষণে আসা যাওয়া করে। এছাড়াও আছে রিক্সা, ভানের দাপাদাপি। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত উস্তি সেতু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০২ এ উদ্বোধন করলেও জেলার বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত ডায়মণ্ডহারবার শহরের যানজটের সমস্যা এতটুকু কমেনি। একই অবস্থা জেলার অন্যতম বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্রের আমতলার। নির্দিষ্ট কোন স্ট্যান্ড না থাকায় বহু ভ্যান রিক্সা, ট্রেকার, অটো, ম্যাটাডোর, লরি রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে। এছাড়া ডায়মণ্ডহারহার রোডের দুপাশে জলনিকাশী খাল বুজিয়ে বাজার দোকান গড়ে উঠেছে এবং ফুটপাত হকারদের দখলে চলে গিয়ে যানজট বেড়েছে। প্রশাসন নির্বিকার। এদিকে গাড়ির সংখ্যা যেমন বেড়েছে, গাড়ির রুট সংখ্যাও তেমনি বেড়েছে। ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে নামখানা, গঙ্গাধরপুর, হারউডপয়েন্ট, কাকদ্বীপ, রামগঙ্গা, দক্ষিণে বিষ্ণুপুরগামী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বাস ছাড়াও মগরা, উস্তি, নূরপুর, রায়চকগামী একস্প্রেস বাস ও ট্রেকারের এসব নিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে যানজট এবং নিত্য দুর্ঘটনা লেগেই আছে। রোডেরও অবস্থা ভালো নয়। ডায়মণ্ডহারবার, বারুইপুর এবং আমতলা শহরের এহেন যানজট সমস্যা মেটাতে চাই বাইপাস রাস্তা, সেতু ও ফ্লাইওভার বা উড়ালপুল নির্মাণ। সম্প্রতি রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অমর চৌধুরী ডায়মণ্ডহারবারের একটি বাইপাস তৈরির কথা ঘোষণা (৯/৮/২০০৫) করেছেন। ডায়মণ্ডহারবার রোজ থেকে এই বাইপাস বেরিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডেই মিশবে। তবে কোন দুটি জায়গা সংযোগস্থল হবে তা এখন্য স্থির হয়নি। ২০০৪ সালেই ডায়মণ্ডহারবার ১১৭নং জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৩০ কিমি. লম্বা এই রস্তাটি বকখালি থেকে বিবেকানন্দ সেতুর মধ্য দিয়ে মুম্বই রোডে গিয়ে মিশবে। ন্যাশনাল হাইওয়ে বা জাতীয় সড়ক ১১৭, জাতীয় সড়ক ৩৩এর সঙগে মিলবে। এছাড়া জেলার পরিবহনের জন্য বহু সেতু নির্মাণের প্রযোজন। এই সেতুগুলি নির্মিত হলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটতে পারে। মূলত কোথাও রেললাইন তো, কোথাও খালনদী নালাগুলির উপর সেতু নির্মাণের প্রয়োজন। সরকারিভাবে বহু সেতুর শিলান্যাস পর্ব শুরু হয়েছে। ২০০৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী রায়চক থেকে হলদিয়া যাবার সংযোগকারী সেতুর শিলান্যাস করেছে। জোকা চড়িয়াল সেতু নির্মিত হয়েছে। মার্চ ১৯৯৬তে সোনারপুরের উড়ালপুলের শিলান্যাস করা হয়। হোটর আমতলা রাস্তায় কেওড়াপুকুর খালের উপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করা হয়। প্রস্তাবিত সোনারপুর উড়ালপুলের মোট দৈর্ঘ্য হবে ৬৫০ মিটার। এই কাজে ব্যয় ধার্য ১৬ কোটি টাকা। তারাতলা উড়ালপুলের কাজ তো সমাপ্তির পথে। এছাড়া প্রস্তাবিত বারুইপুর কুলপিরোড ও পদ্মপুকুর রোডের মাঝখানে লেভেল ক্রসিংয়ের উড়ালপুলের কাজ রেলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে করার কথা। উড়ালপুলটির দৈর্ঘ্য হবে ১১৫০ মিটার। তার মধ্যে ক্যানিং কুলপি রোডের দিকে থাকবে ২৫০ মিটার, রেলগেটের উপরের ও পদ্মপুকুরের দিকে রয়েছে যথাক্রমে ৫০ মিটার ও ৮৫০ মিটার। বারুইপুরে আদি - গঙ্গার পার দিয়ে বাইপাস তৈরির কাজ চলছে যা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের সঙ্গে মিশবে। এছাড়া পরিবহনের গতি বাড়াতে লাইট অ্যান্ড র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্টের বিষয়ে অর্থাৎ দ্রুতগামী যান যলাচলের জন্য জাপানের জেট্রোকে খতিয়ে দেখার কথা শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ঘোষণা করেছেন (১৪/৬/২০০৫)।

বারুইপুর (প্রস্তাবিত জেলা শহর), সোনারপুর, গড়িয়া, ভাঙড় প্রভতিকে নিয়ে বড় শহর (মেগাসিটি) বা বৃহত্তর কলকাতা গড়ার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। নতুন শহর গড়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। মেট্রো রেলকে গড়িয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। রায়দিঘী থানার কঙ্কণদিঘী ও নগেন্দ্রপুর অঞ্চল সংযোগকারী মণিনদীর ওপর ২০ কোটি টাকা ব্যায়ে সেতুর উদ্বোধন (১৬/৮/২০০৫) হয়েছে। ১৮/৮/২০০৫ তারিখে এক হাজার কোটিটাকা ব্যায়ে ৮২ কিমির ছয় অথবা চার লেনের রাস্তা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক বারাসাত থেকে কলকাতা বন্দকে সংযুক্ত করার একটি মেগাপ্রকল্প রূপায়নের কতা ঘোষণা করা হয়েথে। প্রস্তাবিত সাগর বন্দর, কুলপি শিল্পাঞ্চল, রায়চক - হলদিয়া এবং তিনটি জাতীয় সড়ককে পরস্পর সংযুক্ত করতে এটি কার্যকর হবে। ২০০৫ এর ২০ আগস্ট তারিখে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রত্যন্ত পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ ব্লকের সংযোগকারী সপ্তমুখী নদীর ওপর দুর্বাচটি - গঙ্গাধরপুর কংক্রীটের প্রস্তাবিত সেতুটির শিল্যান্যাস হয়েছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে। কলকাতা থেকে সরাসরি বাসে করে সুদূর পাথরপ্রতিমার শেষপ্রান্ত ভগবৎপুর কুমীর প্রকল্প পর্যন্ত পৌছানো যাবে।

সুন্দরবনের মানুষ যাতে মূল অংশের সঙ্গে সরাসরি কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবার কলকাতা হয়ে শিলিগুড়ি যেতে পারেন তার জন্য এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পাথরপ্রতিমাকে সংযোগ কবে এমন আরও একটি রায়পুর ফেরিঘাটে সেতুর কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বর - জানুয়ারি মাসের মধ্যে খুলে দেওয়ার কথা।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সবকিছুর পরিবর্তন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটতেই থাকবে। ডাক, তার, ল্যান্ড টেলিফোন, মোবাইল টেলিফোন পরিষেবা, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রভৃতির মাধ্যমে আজ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে। গোরুর গাড়ি, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ি, ডোঙ্গা প্রভৃতির চলাচল আজ অতীতের বিস্মৃতিতে প্রায় হারিয়েই গিয়েছে।

অন্যান্য তথ্যসূত্র : (১) দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতীত - কালিদাস দত্ত

(২) বজবজের ইতিহাস নকুড়চন্দ্র মিত্র

(৩) পরায়ও পরগা কতা - মনোরঞ্জন রায়

(৪) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস সুকুমার সিং

(৫) বারুইপুরের ইতিহাস - বারুইপুর পৌরসভা কতৃক প্রকাশিত

(৬) পত্রিকা - বর্তমান, আজকাল, প্রতিদিন, দৈনিক স্টেটসম্যান, আলিপুর বার্তা ও পঃ বঃ পত্রিকা (দঃ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা)

লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, সরকারি কর্মচারী